

এত শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে কেন কারণ চিহ্নিত করে প্রতিকারের উদ্যোগ নিন

শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের যেমন কিছু সাফল্য আছে, তেমনি ব্যর্থতাও অনেক। প্রাথমিক পর্যায়ে শতভাগ শিশু বিদ্যালয়ে এলেও ২০ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে না। এরপর যারা মাধ্যমিক পর্যায়ে যায়, তাদেরও ৪০ শতাংশের বেশি শিক্ষা সমাপনের আগেই ঝরে যায়। অর্থাৎ এসএসসি পাস করার আগেই ঝরে যায় অর্ধেকেরও বেশি। সরকারি হিসাবেই এমন তথ্য পাওয়া গেছে। এটি দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতাই তুলে ধরে। ঝরে পড়ার সঠিক কারণগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত প্রতিকারের উদ্যোগ নিতে বলাচেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্য অনুযায়ী, মাধ্যমিক পর্যায়ে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই ঝরে পড়ছে বেশি। ২০১৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, ছাত্রীদের মধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সমাপন করতে পেরেছে মাত্র ৫৪.৮ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় ৪৬ শতাংশ ঝরে পড়েছে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের এত বেশি সংখ্যায় ঝরে পড়া কাম্য নয়। ঝরে পড়া ও বৈষম্যের সঠিক কারণ অনুসন্ধান ধারাবাহিক গবেষণা প্রয়োজন। বিচ্ছিন্ন অনুসন্ধান ঝরে পড়ার কিছু কারণ উঠে এসেছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে বাল্যবিয়ে একটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা। বাল্যবিয়ে আইনত নিষিদ্ধ হলেও আইন প্রয়োগে দুর্বলতা ও পারিবারিক সচেতনতার অভাব রয়েছে। আবার অনেক পরিবারই ছেলের শিক্ষার প্রতি যতটা আগ্রহী হয়, মেয়ের ক্ষেত্রে ততটা হয় না। অনেক অভিভাবক নিরাপত্তার কথা ভেবেও মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেন। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধির পর বখাটের উৎপাতের কথা ভেবেই এমনটি বেশি করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ নিয়েও অনেক অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা না করে এখনো সেখানে শান্তিকেই বেশি পছন্দ করা হয়। বিদ্যালয়ের রুক্ষ আচরণও অনেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবিমুখ করে। পারিবারিক অভাব-অনটনও শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার একটি বড় কারণ। পরিবারের আর্থিক সহায়তার জন্য অনেক অভিভাবকই মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কোনো না কোনো কাজে ঢুকিয়ে দেন। কিছু গবেষণায় পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা পদ্ধতির দুর্বলতাও উঠে এসেছে। সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হলেও এখনো ৫২ শতাংশ শিক্ষকই তা বুঝতে পারেন না। অন্য বিদ্যালয় বা সমিতির সহায়তায় তাঁরা প্রশ্নপত্র তৈরি করেন। যেখানে শিক্ষকরাই বোঝেন না, সেখানে শিক্ষার্থীরা তা বুঝবে কিভাবে? ফলে তাদের মধ্যে পরীক্ষাভীতি ক্রমেই ব্যাপক হয় এবং একসময় লেখাপড়ায় ছেদ টানে। আবার এটি বৈষম্যও বাড়ায়। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তানরা প্রাইভেট কোচিং বা টিউটরের সহায়তায় এ ক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে গেলেও দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। তাই তারাি বেশি করে ঝরে পড়ে। শিক্ষা যেন সর্বজনীন হয়, তা রাষ্ট্রকেই দেখতে হবে। মেয়ে ও ছেলের পার্থক্য, ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য, গ্রাম ও শহরের পার্থক্য—এসব যদি খুব বেশি হয়ে যায়, তাহলে শিক্ষার সর্বজনীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাশাপাশি শিক্ষা যাতে ভীতিকর না হয়ে আগ্রহের বিষয় হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।